হাম্বলি মাযহাবের ক্রম-বিকাশ

ইমরান হেলাল

এই লেখাটি মূলত এগারো পর্বে লেখা ফেসবুক পোস্টের সংকলন। এখানেও মোট এগারোটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে লেখাটি। হাম্বলি মাযহাবের ক্রম-বিকাশ নিয়ে প্রাথমিক ধারণার জন্যে লেখাটি বেশ উপযোগী হবে ইনশা আল্লাহ্। এছাড়াও লেখার শেষে বর্তমানে মাযহাবের ভৌগলিক চিত্র নিয়ে একটি অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে।

হাম্বলিদের ইতিহাসের পাতায় পাঠককে স্বাগতম!

হাম্বলি মাযহাবের ক্রম-বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

পরবর্তী যুগের ‘আলিমগণ মাযহাবের সেসব 'আলিমদের তিনটি যুগে ভাগ করেছেন লেখনির ক্ষেত্রে যাদের কোন না কোন অবদান অবশ্যই আছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ এবং তাদের লেখনির সংখ্যা প্রায় ১৪০০ এর কাছাকাছি।

টাইমলাইনঃ

১) **মুতাক্বাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তীদের যুগঃ** ইমাম আহমাদ (২৪১হি) থেকে আল-হাসান বিন হামিদ (৪০৩হি)।

২) **মুতাওয়াসসিত্বীন বা মধ্যবর্তীদের যুগঃ** আল-ক্বাদি আবু ইয়ালা ((৪৫৮হি) থেকে আল-বুরহান ইবন মুফলিহ (৮৮৪হি)।

৩) **মুতাআখখিরীন বা পরবর্তীদের যুগঃ** 'আলাউদ্দিন আল-মারদাওয়ি (৮৮৫হি) থেকে বর্তমান সময়।

[সূত্রঃ আল-মাদখাল আল-মুফাসসাল; শাইখ বাকর আবু যাইদ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুতাক্বাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তীদের যুগ (২৪১-৪০৩হি):

মাযহাবের ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানি (২৪১হি) নিজে তার মতের উপর ফিকহের কোন পরিপূর্ণ বই রচনা করেননি। বরং তিনি বিনয়াবশত তার ছাত্রদেরও তার ফতোয়া বা মাস'আলা লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করতেন। তিনি বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সংকলনে আগ্রহী ছিলেন এবং অনেক শহর, দেশ ঘুরে অবশেষে তার বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ "আল-মুসনাদ" সংকলন করেন।

ইমাম আহমাদের ছাত্রদের বিশাল একটি অংশ তার ফিকহ, ফতোয়াকে লিপিবদ্ধ করেন। তাদেরকে বলা হয় "আসহাবুল মাসা'ইল"। ইমাম মারদাওয়ি তার "আল-ইনসাফ"-এ প্রায় ১৩১ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইমাম আহমাদের দুই ছেলে আবদুল্লাহ এবং সালিহ, ইসহাক আল-কাওসাজ, হারব আল-কিরমানি, ইবন হানি', আল-মারুযি, আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি (সুনান আবু দাউদের সংকলক) প্রমুখ। এর মাঝে বেশ কিছু বই এখন প্রকাশিত।

কিন্তু ইমাম আহমাদের মাস’আলাগুলো তার ছাত্রদের এসব বইয়ে ছড়ানো ছিটানো ছিল। ইমাম আহমাদের ছাত্রদের ছাত্র ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল (৩১১হি) এসমস্ত মাস’আলাগুলোকে একত্রিত করেন “আল-জামি’/জামি’ আর-রিওয়াআহ ‘আন আহমাদ/জামি’ মাসাইল আল-ইমাম আহমাদ" নামক সংকলনে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই মূল্যবান সংকলনটি আমাদের সময় পর্যন্ত এসে পৌছায়নি।*[1]

এরপর তার ছাত্র ইমাম আবু বাকর ‘আব্দুল ‘আজিজ (৩৬৩হি), যিনি “গুলাম আল-খাল্লাল” নামে বিখ্যাত, সংকলনের কাজকে আরো বিস্তৃত, বিন্যস্ত ও পরিশোধিত করেন।

অপরদিকে ইমাম আবুল কাসিম আল-খিরাক্বী (৩৩৪হি) মনোযোগ দেন মাযহাবের এমন একটি সংক্ষিপ্ত ‘মতন’ রচনার দিকে যা পড়ানো, মুখস্থ করা এবং যা ব্যাখ্যা করে মানুষকে মাস'আলা

---

[1] *সাম্প্রতিক সময়ে শাইখ খালিদ আর-রাব্বাতের নেতৃত্বে 'আলিমদের একটি দল অসংখ্য বইয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইমাম আহমাদের বক্তব্যগুলোকে আবার সংকলন করার চেষ্টা করেছেন এবং "আল-জামি লি উলুম আল-ইমাম আহমাদ" নামে ২২খন্ডে কাজটি প্রকাশিত হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ।

শিখানোর করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। তিনি শাফিঈ ‘আলিম ইমাম মুযানির “মুখতাসার” এর অনুরূপ রচনা করেন “মুখতাসার আল-খিরাক্বী”।

এরপর গুলাম আল-খাল্লালের ছাত্র ইমাম আল-হাসান বিন হামিদ (৪০৩হি) মাযহাবকে একটি স্বতন্ত্র, শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যান। তিনি সংকলনের কাজকে আরো বিন্যস্ত করে রচনা করেন “আল-জামি ফিল-মাযহাব”, ইমাম খিরাক্বীর মুখতাসারকে ব্যাখ্যা করে “শারহুল খিরাক্বী” এবং ইমাম আহমাদ ও তার ছাত্রদের ভাষ্যকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য “তাহযিবুল আজওয়িবাহ”। তার মাধ্যমেই মুতাক্বাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তীদের যুগের সমাপ্তি ঘটে।

[সূত্রঃ আল-মাদখাল আল-মুফাসসাল; শাইখ বাকর আবু যাইদ]

তৃতীয় অধ্যায়

মুতাওয়াসসিত্বীন বা মধ্যবর্তীদের যুগ (৪৫৮-৮৮৪হি):

ইমাম আল-খিরাক্বী তার “আল-মুখতাসার” লেখার পর থেকেই মতন’টি মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাওয়াসসিত্বীন যুগের হাম্বলি ‘আলিমগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং তারা এর ব্যাখ্যা, তাখরিজ, গারিব, মানযুমাহ ইত্যাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। হাম্বলি মাযহাবের ইতিহাসে তর্কাতীতভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে মুখতাসার আল-খিরাক্বীর। ইবন আব্দিল হাদি তার “আদ-দুররুন নাক্বি”তে লিখেছেন যে, মুখতাসার আল-খিরাক্বীর ৩০০ শারহ রচিত হয়েছে! শাইখ বাকর আবু যাইদ মুখতাসারকে কেন্দ্র করে রচিত ৪৬টি বইয়ের নাম খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে ২৯টি হলো শারহ। সর্বপ্রথম শারহটি লিখেন স্বয়ং ইমাম আল-খিরাক্বী (৩৩৪হি), সর্বশেষ ইবনুল মুবরিদ (৮৯৫হি) এবং নিঃসন্দেহে এর সর্বশ্রেষ্ঠ শারহটি হলো ইমাম ইবন কুদামাহর (৬২০হি) “আল-মুগনি”।

মুতাক্বাদ্দিমীনদের সর্বশেষ ইমাম আল-হাসান বিন হামিদ (৪০৩হি) যেখানে গিয়ে থেমেছিলেন, তার ছাত্ররা যেন সেখান থেকেই শুরু করেন। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন তার সময়কার শাইখুল মাযহাব, হাম্বলি মাযহাবের পতাকাবাহী ও তার প্রচারকারী, আল-ইমাম আল-মুজতাহিদ, আল-ক্বাদি আবু ইয়ালা (৪৫৮হি)। আল-ক্বাদি’র আগ পর্যন্ত হাম্বলি মাযহাবের অনুসারিরা শুধুমাত্র ইমাম আহমাদের জন্মস্থান বাগদাদেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আল-ক্বাদি, তার পরিবার ও তার ছাত্ররা হাম্বলি মাযহাবকে ইরাকের অন্যান্য স্থানে, বাইতুল মাক্বদিস ও ফিলিস্তিনি, সিরিয়ার দিমাশকে এবং মিসর পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সেখানে হাম্বলি মাযহাবের পাঠদান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এমনকি রাষ্ট্রীয় বিচারকার্য পর্যন্ত পরিচালনা করতে শুরু করেন। আর এসব কার্যক্রমের অগ্রভাগে ছিল কিছু “হাম্বলি পরিবার”, পরবর্তী পর্বগুলোতে তাদের মধ্য থেকে আমরা শুধুমাত্র ৩টি বিখ্যাত পরিবার (আলে আবি ইয়ালা, আলে কুদামাহ এবং আলে তাইমিয়্যাহ) ও তাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

চতুর্থ অধ্যায়

আলে আবি ইয়ালাঃ

এই পরিবারের প্রথম পূর্বপুরুষ হলেন আল-ক্বাদি আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন আল-হুসাইন ইবন আল-ফাররা (৪৫৮হি)। তিনি ছিলেন তার পরিবারের প্রথম হাম্বলি, কারণ তার বাবা ছিলেন হানাফি 'আলিম। ইমাম আবু ইয়ালা ছিলেন সর্বপ্রথম হাম্বলি ক্বাদি (বিচারক)। ৪৪৭ হিজরিতে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির মৃত্যুর পর আব্বাসীয় খলিফা আল-ক্বায়িম বি আমরিল্লাহ তাকে "দারুল খিলাফা ও আল-হারেম" এর বিচারকের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে অসম্মতি জানালেও পরে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে "হাররান ও হালওয়ান" অঞ্চলের বিচারকার্যের ভারও তাকে দেয়া হয়। আল-ক্বাদি হাম্বলি ফিকহ, উসুল ও খিলাফের উপর প্রায় ৩৯টি বই লিখেন। যেমন, শারহুল খিরাক্বী, কিতাব আর-রিওয়াতাইন, আল-উদ্দাহ ইত্যাদি।

আল-ক্বাদি আবু ইয়ালার তিন ছেলে; এর মধ্যে আল-ক্বাদি আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ (৫২৬হি) হলেন বিখ্যাত "ত্বাবাক্বাত আল-হানাবিলা"'র লেখক এবং অপর এক ছেলে আবু হাযিম মুহাম্মাদ (৫২৭হি) তারও বেশ কিছু বই আছে। আবু হাযিমের চারজন ছেলের মধ্যে তিনজনই ছিলেন ক্বাদি (বিচারক); এর মাঝে প্রসিদ্ধ হলেন আল-ক্বাদি মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ (৫৬২হি), যিনি আল-ক্বাদি আবু ইয়ালা আস-সাগির নামে পরিচিত।

তৎকালীন ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আ'লিম হওয়ার সুবাধে আল-ক্বাদি আবু ইয়ালার হাতে অসংখ্য ছাত্র তৈরি হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন হাম্বলি মাযহাবের দুই দিকপাল; ইমাম আবুল খাত্তাব আল-কালওয়াযানি (৫১০হি) এবং আল-ইমাম আল-মুজতাহিদ আবুল ওয়াফা ইবনু 'আক্বিল (৫১৩হি)।

মাযহাবের প্রসারের ক্ষেত্রে আল-ক্বাদির আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র হলেন ইমাম আবুল ফারাজ 'আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শিরাজী (৪৮৬হি)। ইমাম আশ-শিরাজী বাগদাদে শিক্ষালাভের পর বাইতুল মাক্বদিস চলে আসেন এবং শিক্ষাদান শুরু করেন; আর এসময়েই তার সংস্পর্শে আসেন আলে কুদামাহর প্রথম পূর্বপুরুষগণ। এরপর তিনি ফিলিস্তিনির অন্যান্য অঞ্চলেও শিক্ষাদান করেন এবং সর্বশেষ সিরিয়ার দিমাশকে গিয়ে স্থায়ী হন। তার ছেলে শারফুল ইসলাম আব্দুল ওয়াহহাব দিমাশকে হাম্বলি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন; মানুষের কাছে তাদের বাড়ি "বাইতু ইবনিল

হাম্বলি” নামে পরিচিতি লাভ করে। আর এভাবেই হাম্বলি মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে শামের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পঞ্চম অধ্যায়

আলে-কুদামাহঃ (১)

এটিই হলো সেই পরিবার যা হাম্বলি মাযহাবের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি 'আলিমের জন্ম দিয়েছে। ইবন মুফলিহ তার "আল-মাক্বসাদ আল-আরশাদ" গ্রন্থে শুধুমাত্র এই পরিবার থেকে ৫০ জনের কাছাকাছি 'আলিমের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের প্রথম পূর্বপুরুষ ছিলেন মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ এবং তাদের বাসস্থান ছিল বরকতময় বাইতুল মাক্বদিসের পবিত্র ভূমিতে। এজন্যই তাদের "আল-মাক্বাদিসা" বলা হয়। আল-ক্বাদি আবু ইয়ালার ছাত্র ইমাম আব্দুল ওয়াহিদ আস-শিরাজী যখন বাইতুল মাক্বদিসে আসেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ ও তার ছেলেকে কুর'আন হিফযের জন্য আহ্বান করেন এবং তিনি তা সম্পন্ন করেন, এভাবে হাম্বলি মাযহাবের সাথে তার পরিবারের পরিচয় ঘটে। তার দুই ছেলে ইউসুফ (যিনি আলে ইবনিল হাদির পূর্বপুরুষ) এবং আহমাদ (যিনি আলে কুদামাহর পূর্বপুরুষ)। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ বাইতুল মাক্বদিসের "জাম্মাইল" এর খতিব ছিলেন। ৫৫১ হিজরিতে ক্রুসেডাররা বাইতুল মাক্বদিস দখল করে নিলে আহমাদ তার দুই ছেলে আবু উমার মুহাম্মাদ ও আল-মুয়াফফাক আব্দুল্লাহ এবং তার অন্যান্য নিকট আত্মীয়সহ [এদের মধ্যে ছিল আলে সারুর এবং বানু আল-সা'দী] দিমাশকের "আস-সালিহিয়া"তে হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে তারা অসুস্থ হয়ে পরায় দুই বছর অবস্থানের পর তারা "কাসিউন" পর্বতের পাদদেশে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ (৫৫৮হি) মারা যাওয়ার পর পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেন আশ-শাইখ আল-ইমাম আল-ফাকিহ আবু উমার মুহাম্মাদ বিন আহমাদ (৬০৭হি)। তিনি আস-সালিহিয়াতে "আল-মাদরাসাতুল উমারিয়া আশ-শাইখিয়া" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি হাম্বলি মাযহাব ও সর্বোপরি ইসলাম শিক্ষাদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আল-মুয়াফফাক তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি আমাদের বড় করেছেন, শিক্ষাদান করেছেন; তিনি পুরো একটি জামায়াতের জন্য বাবার মত ছিলেন, তিনিই আমাদেরকে হিজরত করিয়ে নিয়ে এসেছেন, বাগদাদে পাঠিয়েছেন, ঘর তৈরি করেছেন, আমরা বাগদাদ থেকে ফেরত আসলে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন, এরপর আমাদের জন্য পৃথক ঘর বানিয়ে দিয়েছেন"।

আল-মুয়াফফাক তার খালাত ভাই আব্দুল গনি ইবন আব্দিল ওয়াহিদ ইবন সারুরকে নিয়ে বাগদাদ আসেন এবং সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ট হাম্বলি 'আলিম ইমাম আব্দুল কাদির আল-জিইলীর [জিয়লানী] কাছে যান। তার কাছে মুখতাসার আল-খিরাক্বী পড়া শুরু করেন। এর ৪০ বা ৫০ দিন

পর ইমাম আল-জিয়লানী (৫৬১হি) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তারা বাগদাদের অন্যান্য ‘আলিমদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন [যাদের মধ্যে আছেন ইমাম ইবনুল জাওযি]। তারা সকালে একসাথে ঘর থেকে বের হতেন এবং রাতে প্রতিদিন রাতে দু’জন বাসায় ফিরে একে অপরের সাথে মুনাযারা করতেন। লোকেরা এই দু’জন যুবককে ভালবাসতো। আল-মুয়াফফাক মুখস্থ করেন আল-খিরাক্কীর “আল-মুখতাসার” এবং আব্দুল গনি মুখস্থ করেন আবুল খাত্তাবের “আল-হিদায়াহ”। পরবর্তীতে আল-মুয়াফফাক ঝুঁকে যান ফিকহের প্রতি, আর আব্দুল গনি হাদিসের প্রতি। এই আব্দুল গনি কে ছিলেন আপনারা কি চিনতে পেরেছেন? উনিই হলেন বিখ্যাত “উমদাতুল আহকাম” এবং “আল-কামাল ফি আসমা আর-রিজাল” এর লেখক আল-ইমাম আল-মুহাদ্দিস আল-হাফিয আব্দুল গনি আল-মাক্কদিসি (৬০০হি) আর তার আপন ভাই ছিলেন আল-ইমাম আল-মুহাদ্দিস আল-‘আবিদ ইমাদ আদ-দীন ইব্রাহিম আল-মাক্কদিসি (৬১৪হি) যার সম্পর্কে আল-মুয়াফফাক বলেছিলেন, “আমার যে বয়স থেকে তাকে জানি, সে কখনো একবারের জন্যও আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে বলে জানি না”, “তিনি আমাদের সাথীদের মধ্যে সর্বোত্তম”।

উপরে যাদের কথা বললাম, তাদের সবার জীবনী রচনা করেছেন, তাদের সবার ভাগ্নে এবং ছাত্র "আল-মুখতারাহ"র লেখক আল-ইমাম আল-মুহাদ্দিস আল-হাফিয দ্বিয়া আদ-দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহিদ বিন আব্দির রহমান আস-সা’দী (৬৪৩হি)। আর আল-হাফিয আদ-দ্বিয়ার চাচাত ভাই হলেন উমদাতুল ফিকহের বিখ্যাত শারহ "আল-উদ্দাহ"র লেখক ইমাম বাহাউদ্দীন আব্দুর রহমান বিন ইব্রাহিম আল-মাক্কদিসি (৬২৪হি)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলে-কুদামাহঃ (২)

শাইখুল ইসলাম আল-ইমাম আল-ফাক্বিহ আল-মুজতাহিদ মুয়াফফাক্ব আদ-দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ আল-মাক্বদিসি (৬২০হি), শুধুমাত্র হাম্বলি ফিকহে নয় বরং ইসলামি ফিকহের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম। তার ইলমি মর্যাদা বর্ণনা করার স্থান এটি নয়, শুধুমাত্র দু'জন ইমাম তার সম্পর্কে যা বলেছেন, তা-ই যথেষ্ট। ইমাম ইবন গুনাইমাহ বলেছেন, "আমাদের যুগে আল-মুয়াফফাক্ব ছাড়া আর কেউ ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছেন বলে আমি জানি না"। আর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া তো আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "আল-আওযায়ীর (১৫৭হি) পর শাইখ আল-মুয়াফফাক্বের চেয়ে ফিকহে অধিক জ্ঞানী কেউ শামে প্রবেশ করেনি"।

ইমাম আল-মুয়াফফকাক্ব হাম্বলি ফিকহের ছাত্রদের ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য ৪টি বই লিখেন। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য মাযহাবের শুধুমাত্র প্রসিদ্ধতম রিওয়া'য়াতের উপর ভিত্তি করে "উমদাতুল ফিকহ", এরপর মাযহাবের ভেতরকার একাধিক রিওয়া'য়াতের উপর "আল-মুক্বনি", এরপর মাযহাবের দলিলসহ "আল-কাফি" এবং সর্বশেষ "আল-মুগনি" যেখানে দলিল, মাযহাবের অভ্যন্তরীণ খিলাফ, অন্যান্য মাযহাবের সাথে খিলাফ (আল-খিলাফ আল-'আলি), বিভিন্ন হুকুমের পেছনের ব্যাখ্যা (তা'লিল) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছেন; যা সম্পর্কে ইমাম ইজ্জ আদ-দীন বিন আব্দিস সালাম বলেছেন, "ইলমের বিচারে ইসলামের কিতাবসমূহের মাঝে ইবন হাযমের "আল-মুহাল্লা" এবং শাইখ মুয়াফফাক্ব আদ-দীনের "আল-মুগনি"র মত কোন কিতাব আমি দেখিনি"। এছাড়াও উসুলুল ফিকহে তার "রওদাতুন নাযির" হাম্বলিদের নির্ভরযোগ্য কিতাব।

আমরা আগে বলেছিলাম, ইমাম আল-খিরাক্বীর "আল-মুখতাসার" রচনার পর থেকেই হাম্বলি 'আলিমদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, স্বয়ং ইমাম ইবন কুদামাহর "আল-মুগনি"ও কিন্তু এই মুখতাসারের শারহ। কিন্তু যখনই ইমাম তার "আল-মুক্বনি" রচনা করলেন, তখন থেকেই হাম্বলি মাযহাবের 'আলিমদের মনোযোগ ঘুরে গেল এবং তার সময় থেকে শুরু করে মুতাআখখিরীনদের শেষ পর্যন্ত লেখনির মূলকেন্দ্রে চলে আসে আল-মুক্বনি। এর শারহ, হাশিয়া, হাদিসের তাখরিজ, তাসহিহ, তানকিহ, এমনকি মুখতাসার পর্যন্ত রচিত হয়। সামনে মুতাআখখিরীন যুগের আলোচনায় আমরা সেগুলো উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ।

আর আল-মুক্বনির সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিস্তৃত শারহটি রচনা করেছেন তারই অন্যতম ছাত্র এবং ভাতিজা আল-ইমাম আল-ফাক্বিহ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ (৬৮২হি), যিনি ইবন আবি উমার নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। শারহটির নাম "আশ-শাফি" তবে হাম্বলিদের কাছে "আশ-শারহুল কাবির" নামেই বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি আল-মুক্বনির এই শারহটি রচনার ক্ষেত্রে ইবন কুদামাহর "আল-মুগনি"র উপর নির্ভর করেছেন এবং অনেকটা সেই পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়েছেন। তাহলে এটা লিখে লাভ কী হলো? লাভটা হলো, ইমাম ইবন কুদামাহর "আল-মুগনি" যেহেতু "মুখতাসার আল-খিরাক্বী"র ব্যাখ্যা তিনি সেখানে ফিকহের অধ্যায়গুলোর ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে ইমাম-খিরাক্বীর পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মুতাআখখিরীনদের বা আমরা বর্তমানে ফিকহের বইগুলোতে অধ্যায়ের যে ধারাবাহিকতা পাই, সেটি এর ব্যতিক্রম। কারণ পরবর্তী 'আলিমগণ তাদের রচনায় "আল-মুক্বনি"র পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। একারণে আমাদের জন্য কোন মাস'আলার আলোচনা "আশ-শারহ"-এ খুঁজে পাওয়া "আল-মুগনি"র চেয়ে সহজ।

ইবন আবি উমারের বাবা অর্থাৎ ইমাম আবু উমার মুহাম্মাদ যার আলোচনা আগের পর্বেই গত হয়েছে, তার তিন সন্তান উমার, আব্দুর রহমান এবং আব্দুল্লাহ। ইবন আবি উমারই হলেন আব্দুর রহমান এবং তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়ার শিক্ষকের মধ্যে অন্যতম। আর তার অপর ভাই আব্দুল্লাহর নাতি হলেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার ছাত্র, "আল-ফাইক্ব" এর রচয়িতা, শাইখুল হানাবিলা ফিশ-শে'র (কবিতা) আহমাদ বিন আল-হাসান, যিনি ইবনুল ক্বাদি আল-জাবাল (৭৭১হি) নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম ইবন কুদামাহর দুই মেয়ে এবং তিন ছেলে সবাই তার জীবদ্দশায় মৃতুবরণ করেন, শুধুমাত্র তার ছেলে ঈসার দুইজন ছেলে সন্তান ছিল, তারাও পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং আলে কুদামাহর পরবর্তী সদস্যরা সবাই ইমাম আবু উমারের বংশধর। পরবর্তীতে তার ছেলেদের মধ্য থেকে বানু ক্বাদি আল-জাবাল এবং বানু যুরাইক্ব নামক দু'টি পরিবারের সৃষ্টি হয়।

সপ্তম অধ্যায়

আলে তাইমিয়্যাহঃ

এই পরিবারের প্রথম পূর্বপুরুষ হলেন আবুল ক্বাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাইমিয়্যাহ; উনার বাবা মুহাম্মাদের নামের সাথেই সর্বপ্রথম "তাইমিয়্যাহ" লক্বটি যুক্ত হয়। আবুল ক্বাসিমের দুই ছেলে আব্দুল্লাহ এবং মুহাম্মাদ। আব্দুল্লাহর একটিই ছেলে, আর তিনি হলেন শাইখুল মাযহাব আল-ইমাম মাজদ আদ-দীন আবুল বারাকাত আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ (৬৫২হি)। তার তিন ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন ইমাম শিহাব আদ-দীন আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়্যাহ (৬৮২হি)। উনারও তিন ছেলে – আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান এবং আহমাদ। আর এই আহমাদই হলেন আমাদের সবার পরিচিত শাইখুল ইসলাম ত্বাকি আদ-দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ (৭২৮হি)। হাম্বলিদের শাব্দিক ব্যবহারে "ইবন তাইমিয়্যাহ" বলতে সাধারণভাবে দাদা-বাবা-নাতি তিনজনের প্রত্যেককেই বুঝানো হয়, ইমাম ইবন রজব যাদেরকে বিশেষায়িত করেছেন চাঁদ-তারা-সূর্য বিশেষণে। শাইখুল ইসলাম যেহেতু বিয়ে করেননি, তাই এরপর এই বংশধারাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী আলে তাইমিয়্যাহর সবাই [যেমনঃ বানু আল-মাওয়াহিবি] মুহাম্মাদ বিন আবিল ক্বাসিমের বংশধর।

দাদা ইবন তাইমিয়্যাহ, যিনি হাম্বলিদের মাঝে "আল-মাজদ" নামে বেশি পরিচিত, ছিলেন ইমাম ইবন কুদামাহর ছাত্র এবং ইবন কুদামাহর শিক্ষক ইমাম ইবনুল মাননীর আরেক ছাত্র ইমাম গুনাইমাহর ছাত্র। তিনি এবং তার চাচা ফাখর আদ-দীন মুহাম্মাদ ইবন তাইমিয়্যাহ দু'জনেরই "আল-হিদায়া"র উপর শারহ রয়েছে। তবে হাম্বলি মাযহাবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটি হলো "আল-মুহাররার", যার অনেকগুলো শারহের মধ্যে অন্যতম হলো তার নাতি শাইখুল ইসলামের "আত-তা'লীক্ব আল-মুক্বাররার" এবং ইবন রজব আল-হাম্বলির "শারহুল মুহাররার"। এছাড়াও হাদিসের ক্ষেত্রে তার "মুনতাক্বা আল-আখবার" যার বিখ্যাত শারহ হলো ইমাম আশ-শাওকানির "নাইলুল আওতার"; এবং উসুলুল ফিকহের ক্ষেত্রে "আল-মুসাওওদাহ ফি উসুলিল ফিকহ"। মুসাওওদাহ শব্দের অর্থ হলো খসড়া বা ড্রাফট, এর কারণ হলো আল-মাজদ এটি লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু আর শেষ করেননি, বরং খসড়া হিসেবেই এটা রয়ে যায়, এরপর তার ছেলে ইবন তাইমিয়্যাহ এতে আরো কিছু সংযোজন করেন, কিন্তু তিনিও সেটি সম্পূর্ণ করেননি, এরপর নাতি ইবন তাইমিয়্যাহ এসে আরো সংযোজন করেন, কিন্তু এরপরও এটি খসড়া হিসেবেই ছিল। পরবর্তীতে শাইখ আবুল আব্বাস আহমাদ আল-হাররানি এটিকে বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করেন।

যাই হোক, হাম্বলি মাযহাবে “আশ-শাইখাইন” বলতে বুঝানো হয় ইমাম আল-মুয়াফফাক ইবন কুদামাহ এবং ইমাম আল-মাজদ ইবন তাইমিয়্যাহকে। আল-মুয়াফফাকের অন্যতম ছাত্র হলেন “আশ-শারিহ” ইমাম ইবন আবি উমার এবং আল-মাজদের অন্যতম ছাত্র তার ছেলে ইমাম আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়্যাহ। আর ইবন আবি উমার এবং আব্দুল হালিম এই দুজনের অন্যতম ছাত্র হলেন আল-ইমাম আল-মুজতাহিদ শাইখুল ইসলাম ত্বাকি আদ-দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ।

শাইখুল ইসলাম সম্বন্ধে আমি এখানে কী লিখবো, এটাই বুঝে উঠতে পারছি না! তার ইলমি মর্যাদা, তার বইয়ের নাম, নাকি তার ছাত্রদের কথা? আপাতত হাম্বলি মাযহাবের ভেতরেই যদি থাকি, উমদাতুল ফিকহের উপর লেখা তার অসমাপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ “শারহুল উমদাহ” হাম্বলি মাযহাবের মাস'আলাগুলোর পক্ষে দলিল এবং যুক্তি প্রমাণের অন্যতম উৎস। তার উসুলুল ফিকহের বইগুলোও গুরুত্বপূর্ণ, ইমাম আহমাদের কোন রিওয়া'য়াতকে সাব্যস্ত করা বা প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য মুতাআখখরীন জন্য নির্ভরতার স্থান। তার ছাত্রদের মধ্যে ইবন ক্বাদি আল-জাবাল, ইবন 'আব্দিল হাদি, ইবনু মুফলিহ [আগামী পর্বে আলোচ্য ইন শা আল্লাহ] কিংবা ইবনুল কায়্যিম [যার ছাত্র আবার ইবনু রজব] হাম্বলি মাযহাবের একেক জন স্তম্ভ। মুতাআখখিরীন ইমামদের [আল-মারদাওয়ি, আল-হাজ্জাওয়ি, ইবন আন-নাজ্জার, মারি' আল-কারমি] বইগুলো তার বক্তব্য ও মতামত দিয়ে পরিপূর্ণ। এমনকি হাম্বলিদের মধ্যে 'আকিদাহর ক্ষেত্রে যারা তার বিরোধিতা করেছেন, তাদের কাছেও মাযহাবের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য প্রামাণ্যস্বরূপ এবং তার মর্যাদা অনস্বীকার্য। তবে একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে, আল-ক্বাদি আবু ইয়ালা, আবুল খাত্তাব, ইবন আক্বিল কিংবা আল-মুয়াফফাকের ইজতিহাদকৃত সব ইখতিয়ারাত [পছন্দ] বা তারজীহ [অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত] যেমন হাম্বলি মাযহাবের মু'তামাদ বা মাশহুর নয়, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই প্রযোজ্য। তার ইখতিয়ারাতগুলো সংকলন করেছেন ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ছেলে ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবনুল কায়্যিম (৭৬৭হি)।

অষ্টম অধ্যায়

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহর ছাত্রদের মাঝে হাম্বলি ফিকহের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন, তিনি হলে ইমামুল হানাবিলা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুফলিহ (৭৬৩হি)। এমনকি ইমাম ইবনুল কায়্যিম, যিনি সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলামের সবচেয়ে কাছের এবং অধিক জ্ঞানী ছাত্র ছিলেন, তিনি পর্যন্ত কোন মাস'আলায় শাইখুল ইসলামের ইখতিয়ারাত [পছন্দ] জানার জন্য ইবনু মুফলিহ-এর স্বরণাপন্ন হতেন। ইবনু মুফলিহ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "এই আকাশের নিচে ইবনু মুফলিহ অপেক্ষা ইমাম আহমাদের মাযহাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই"।

ইবনু মুফলিহ "শারহুল মুক্বনি" রচনা করেন, তবে মাযহাবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হলো "আল-ফুরু"। তিনি আল-ফুরু'তে মাযহাবের অসংখ্য ফুরু'য়ী মাস'আলাগুলোকে একত্রিতকরণ ও সম্পাদনা, মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য, অন্য তিন মাযহাবের সাথে ঐক্যমত ও বিরোধ, শাইখুল ইসলাম ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিমের ইখতিয়ারাত লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পরবর্তী হাম্বলি 'আলিমদের জন্য "আল-ফুরু" হলো মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য [মু'তামাদ] গ্রন্থ, বিশেষত মাযহাবকে তাসহীহ, তানক্বীহ [পরিশুদ্ধ] ও তারজীহ [অগ্রাধিকার] দেয়ার ক্ষেত্রে।

ইবনু মুফলিহ, "কিফায়াতুল মুস্তাক্বনি লি আদিল্লাতিল মুক্বনি" গ্রন্থ রচয়িতা আল-ক্বাদি জামাল আদ-দীন ইউসুফ আল-মারদাওয়ির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তার শ্বশুর আল-ফুরু'র উপর "আন-নিহায়াহ" নামক হাশিয়া লিখেছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর ইবনু মুফলিহ ক্বাদির পদে আসীন হন। তার চার ছেলের মধ্যে বুরহান উদ্দীন ইব্রাহিম (৮০৩হি) "শারহুল মুক্বনি" রচনা করেন এবং তার ছেলে উমার বিন ইব্রাহিম (৮৭২হি) ছিলেন ফিলিস্তিনের 'গাজ্জা'র সর্বপ্রথম হাম্বলি ক্বাদি। ইবনু মুফলিহর আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ (৮৩৪হি) ছিলেন তার সময়কার শামের শাইখুল হানাবিলা এবং তার নাতি বুরহান উদ্দীন ইব্রাহিম (৮৮৪হি) হলেন আল-মুক্বনির বিখ্যাত শারহ "আল-মুবদি'" এবং "আল-মাক্বসাদ আল-আরশাদ" গ্রন্থের রচয়িতা; আর উনিই হলেন মুতাওয়াসসিত্বীন যুগের সর্বশেষ হাম্বলি 'আলিম।

মুতাওয়াসসিত্বীন যুগের যেসব 'আলিম এবং তাদের লেখনি সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, এর বাইরেও এই যুগে লেখনির ক্ষেত্রে প্রথিতযশা এমন অনেক হাম্বলি 'আলিম ছিলেন, যাদের নামটা অন্তত উল্লেখ করা উচিত। যেমনঃ ইবনুল বান্না, ইবনুয যাগুনী, ইবন হুবাইরা, ইবনুল মাননী, ইবনুল জাওযি, ইবন গুনাইমাহ, আস-সামুরি, ইবন হামদান, আল-মুনাজ্জা, ইবন

আব্দিল ক্বাওয়ি, ইবন আবিল ফাতহ আল-বা'লী, নাজমুদ্দীন সুলাইমান আত-তুফী, ইবন আব্দিল হাদী, আয-যারকাশী, ইবনু রজব, ইবনুল লাহহাম, ইবন নাসরিল্লাহ, আল-যারা'য়ী। এই যুগে সর্বমোট ১৬৬ জন হাম্বলি ফক্বীহ ছিলেন, হাম্বলি ফিকহ ও উসুলের ক্ষেত্রে যাদের রচনার সংখ্যা ৫৫০ এর কাছাকাছি। রাহিমাহুমুল্লাহু আজমা'ইন।

প্রসঙ্গত আমরা যেহেতু মাযহাবের ভৌগোলিক বিস্তার নিয়েও একই সাথে আলোচনা করছি; ইরাক ও শামের পর যে দেশে মাযহাবের শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছিল সেটি হলো মিসর। মিসরে সর্বপ্রথম যে হাম্বলি 'আলিম স্থায়ী হয়েছিলেন, তিনি হলেন শাইখ উসমান বিন মারযুক (৫৬৪হি), এরপর হাফিয আব্দুল গনি আল-মাক্বদিসিও মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন এবং ৫৬৬-৫৭০হি পর্যন্ত এখানে ছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মিসরে হাম্বলিদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। আমাদের জানা থাকার কথা মিসরের ক্ষমতা হিজরি ৪র্থ শতাব্দীতে শিয়া ফাতেমিদের হাতে চলে গিয়েছিল, যারা মিসর থেকে সুন্নি 'আলিমদের বের করে দিয়েছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে সালাউদ্দীন আইয়্যুবি সেখানে সুন্নিদের ক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়ে আনার পর সব মাযহাবের 'আলিমগণ আবার মিসরে ফেরত আসেন। আয়্যুবি শাসনকালের একেবারে শেষের দিকে হাম্বলি 'আলিমগণ মিসরে আসেন। এরপর যার হাত ধরে মিসরে হাম্বলি মাযহাবের শিক্ষাদান ও প্রসার ঘটে, তিনি হলেন ইমাম আল-ক্বাদি 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাওয়ি (৮৬৯হি), তিনি মিসরে হাম্বলিদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর পর বিচারকের দায়িত্ব পান তার নাতি নাসরুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হাজ্জাওয়ি (৮৯৫হি), এরপর তার বংশধরদের বেশ কয়েকজন মিসরে ক্বাদির দায়িত্ব পালন করেন।

নবম অধ্যায়

মুতাআখখিরীন বা পরবর্তীদের যুগঃ (৮৮৫হি –)

এই যুগে রয়েছেন প্রায় ১০০ জন হাম্বলি ফক্বীহ, ফিকহে যাদের লেখনির সংখ্যা ৭০০ এর কাছাকাছি। যাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন শাইখুল মাযহাব আল-মুনাক্কিহ আল-ইমাম আল-ক্বাদি 'আলাউদ্দিন 'আলি বিন সুলাইমান আল-মারদাওয়ি (৮৮৫হি)। উল্লেখযোগ্য ফকিহদের মধ্যে আছেনঃ ইউসুফ বিন আব্দিল হাদি, আশ-শুয়ুকী, আল-হাজ্জাওয়ি, ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি, মার'ই আল-কারমি, আল-বুহুতি, আল-বালবানি, আর-রুহাইবানি, আল-মানকুর, উসমান আন-নাজদি, আল-'আনকারি, ইবনু মানি'ই, ইবন ক্বাসিম, আশ-শিত্বী, ইবন বাদরান প্রমুখ। রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাইন।

মুতাআখখিরীনদের কাছে হাম্বলি মাযহাবের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য [মু'তামাদ] মত মূলত তিনটি বইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং এই তিনটি বই-ই রচনা করেছেন ইমাম আল-মারদাওয়ি।

আমাদের আগের আলোচনাগুলো থেকেই স্পষ্ট যে, ক্রম-বিকাশের এই পর্যায়ে এসে মাযহাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুটি হলো ইমাম ইবন কুদামাহর "আল-মুক্বনি" এবং ইমাম ইবনু মুফলিহর "আল-ফুরু"। আল-মারদাওয়ি তাই মাযহাবকে পরিশুদ্ধ করার কাজে এই দুটি বইকেই বেছে নিলেন। সর্বপ্রথম তিনি শুরু করলেন "আল-মুক্বনি" দিয়ে এবং রচনা করলেন হাম্বলিদের বিস্ময়গ্রন্থ "আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ"। ইমাম মারদাওয়ি তার সময় পর্যন্ত রচিত হওয়া সব গ্রন্থগুলোকে সামনে রাখলেন, এরপর মু'তামাদ গ্রন্থ এবং মু'তামাদ 'আলিমগণের মতগুলোকে বাছাই করলেন। এরপর আল-মুক্বনির প্রত্যেকটি মাস'আলা ধরে ধরে মাযহাবের যত রিওয়া'য়াত, ওয়াজহ, ইহতিমালাত এবং ক্বওল তিনি খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলো লিপিবদ্ধ করলেন। এভাবে এক "আল-ইনসাফ" গ্রন্থের ভিতর মাযহাবের পূর্ববর্তী শত শত বই নিবন্ধিত হয়ে গেল। এছাড়াও তিনি আরো বহু ফাওয়াইদ ও তানবিহাত যুক্ত করেছেন; তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল ইবন কুদামাহ মাযহাবের অভ্যন্তরীণ যে মতপার্থক্যগুলোকে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত দেননি [আল-খিলাফ আল-মুত্বলাক্ব], সেগুলোর বিশুদ্ধতম মতটি খুঁজে বের করা এবং যে মাস'আলাগুলোতে ইবন কুদামাহ মাযহাবের মু'তামাদ হিসেবে এমন মত উল্লেখ করেছেন, যা মূলত মু'তামাদ নয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করে বিশুদ্ধ মতটি উল্লেখ করা।

৮৭১ হিজরিতে ইমাম আল-মারদাওয়ি “আল-ইনসাফ” লেখা শেষ করেন, এরপর তিনি “আল-ফুরু”তে হাত দেন, এবং রচিত হয় “তাসহীহ আল-ফুরু” [আদ-দুররুল মুনতাক্বা ওয়াল জাওহারুল মাজমু’উ ফি তাসহীহিল খিলাফ আল-মুত্বলাক্ব ফিল ফুরু’] । ইবনু মুফলিহর “আল-ফুরু” মাযহাবের মু’তামাদ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কলেবরে সবচেয়ে বৃহৎ, অসংখ্য শাখাগত মাস’আলার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার কারণে। ইবনু মুফলিহ গ্রন্থটি রচনাই করেছিলেন প্রত্যেক মাস’আলায় মাযহাবের মু’তামাদ ও বিশুদ্ধ মতটি খুঁজে বের জন্য। আল-মারদাওয়ি “তাসহীহ আল-ফুরু”তেও ঠিক তাই করলেন, যা তিনি “আল-ইনসাফ”-এ করেছেন। তিনি প্রায় ২২২০টি মাস’আলার বিশুদ্ধ মত খুঁজে বের করলেন, যেগুলোতে ইবনু মুফলিহ মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য আছে বলে উল্লেখ করেছেন। [অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই এক্ষেত্রে তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।]

এরপর ইমাম আল-মারদাওয়ি আবার “আল-মুক্বনি”তে ফিরে গেলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন “আল-ইনসাফ”কে সংক্ষিপ্ত করে শুধুমাত্র মু’তামাদ মতটিকে “আল-মুক্বনি”র সাথে যুক্ত করে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন, এভাবে রচিত হলো “আত-তানকীহ আল-মুশবি’ই ফি তাহরীরি আহকামিল মুক্বনি”। তিনি এর লেখার কাজ শেষ করেন ৮৭৮ হিজরিতে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সর্বশেষ চতুর্থবার ৮৮১ হিজরিতে এটিকে আরো পরিশুদ্ধ করেন। এজন্যই কোন মাস’আলায় “আত-তানকীহ”-এর মতটি হলো মাযহাবের বিশুদ্ধতম ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।

ইমাম আল-মারদাওয়ি হাম্বলি মাযহাবের শত শত বই ঘেঁটে বিশুদ্ধতম ও নির্ভরযোগ্য মতগুলো খুঁজে বের করেছেন, এজন্যই তাকে “মুনাক্কিহুল মাযহাব” বলা হয়। মূলত ইমাম মারদাওয়ি তার গ্রন্থ তিনটি লেখার পর অধিকাংশ মাস’আলায় হাম্বলি মাযহাবের মু’তামাদ মত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং মাযহাবের স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এছাড়াও উসুলুল ফিকহে তিনি লিখেছেন “তাহরীর আল-মানকুল” এবং পরবর্তীতে নিজেই এর ব্যাখ্যা “আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর” রচনা করেন।

দশম অধ্যায়

শাইখুল মাযহাব ইমাম আল-মারদাওয়ি শুধুমাত্র মু'তামাদ মতের উপর ভিত্তি করে "আত-তানকীহ" লিখলেন বটে, কিন্তু একটি সমস্যা রয়ে গেল। আল-মারদাওয়ি "আত-তানকীহ"তে শুধুমাত্র সে মাস'আলাগুলোই উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে আসল অর্থাৎ "আল-মুক্বনি"র লেখক ইমাম ইবন কুদামাহ সরাসরি কোন মত দেননি বা কোন অস্পষ্টতা রয়েছে বা মাযহাবের মু'তামাদ মতের বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু বাকি মাস'আলাগুলো যেক্ষেত্রে উপরের কোনটাই ঘটেনি, সেগুলো আল-মারদাওয়ি উল্লেখ করেননি; এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটা হলো কেউ যদি মাযহাবের মু'তামাদ মত জানতে চায়, তাকে একবার "আল-মুক্বনি" আরেকবার "আত-তানকীহ" দেখতে হবে, এবং অবশ্যই এটি কষ্টকর। সুতরাং এই সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় হলো, "আল-মুক্বনি" ও "আত-তানকীহ"কে একটি 'মতন'-এ পরিণত করা। আর এই কাজটিই করেছেন আশ-শাইখ আল-আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি (৯৭২হি), তার "মুনতাহাল ইরাদাত ফি জাম'ইল মুক্বনি মা'আ-তানকীহ ওয়ায যিয়াদাত" গ্রন্থে।

তিনি ছিলেন মিসরের অধিবাসী এবং তার বাবা আল্লামা আহমাদ ইবনুন নাজ্জার, মিসরের প্রধান বিচারপতি এবং একজন হাম্বলি ফক্বীহ ছিলেন, "আল-মুসতাও'ইব", "আল-ওয়াজীয" ও "আত-তানকীহ"র উপর তিনি হাশিয়া লিখেছেন। শাইখ ইবনুন নাজ্জার বইটি রচনা করেন শামে এবং মাযহাবের মু'তামাদ মতের উপর মাস'আলাগুলোকে সম্পাদনা করে আবার মিসর ফেরত আসেন। বইটির সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয় ৯৪২ হিজরিতে। বের হওয়ার সাথে সাথেই "আল-মুনতাহা" হাম্বলি 'আলিমদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং লেখকের জীবদ্দশাতেই এর ব্যাপক প্রসার ঘটে ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বয়ং তার বাবা শাইখ আহমাদ তার ছাত্রদের "আল-মুনতাহা" পড়াতেন এবং এর প্রশংসা করতেন।

যাই হোক, শাইখ ইবনুন নাজ্জার "আল-মুনতাহা"র কলেবর যথাসম্ভব ছোট রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন, কিন্তু এতে করে এর বাক্যবিন্যাস একটু কঠিন হয়ে যায়। এর সমাধান করার জন্য তিনি এর চমৎকার ব্যাখ্যা রচনা করেন "মা'উনাতু উলিন নুহা শারহ আল-মুনতাহা" নামে। পরবর্তীতে তার নাতি শাইখ উসমান ইবনুন নাজ্জার "আল-মুনতাহা"র উপর একটি হাশিয়া লিখেছেন। শাইখ ইবনুন নাজ্জার উসুলুল ফিকহে ইমাম আল-মারদাওয়ির "আত-তাহরীর"কে সংক্ষিপ্ত করেন এবং পরবর্তীতে নিজেই এর ব্যাখ্যা রচনা করেন "শারহুল কাওকাব আল-মুনির" নামে, যা হাম্বলিদের জন্য উসুলুল ফিকহের অন্যতম মু'তামাদ গ্রন্থ।

এদিকে শাইখ ইবনুন নাজ্জার যখন “আল-মুনতাহা” রচনা করছিলেন, তখন তার পূর্বেই খোদ শামের আরেক জন হাম্বলি ফক্বীহ শুধুমাত্র মু’তামাদ মতের উপর ভিত্তি করে এমন একটি ‘মতন’ রচনায় মনোযোগ দিয়েছিলেন, যেটি মাযহাবের পূর্ববর্তী মু’তামাদ গ্রন্থগুলো ও ইমাম আল-মারদাওয়ির তিনটি বইয়ের নির্যাস একত্রিত করতে পারবে এবং যেখানে ফিকহের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মোটামুটি সব মাস’আলা সন্নিবেশিত থাকবে। তিনি হলেন আশ-শাইখ আল-আল্লামা শারফুদ্দীন মুসা বিন আহমাদ আল-হাজ্জাওয়ি (৯৬৮হি), এবং তার গ্রন্থটি হলো “আল-ইক্বনা লি ত্বালিবিল ইনতিফা’আ”। “আল-ইক্বনা” হলো মাযহাবের মু’তামাদ মতের উপর লিখিত সর্ববৃহৎ ‘মতন’, এতে আলোচ্য মাস’আলার সংখ্যা অনেক বেশি এবং এর বাক্যরীতি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। একারণেই “আল-মুনতাহার”র উপর রচিত বহুসংখ্যক শারহ ও হাশিয়ার বিপরীতে, “আল-ইক্বনা”র উপর মাত্র একটি শারহ এবং দুটি হাশিয়া রচিত হয়েছে। “আল-মুনতাহা”র মতই “আল-ইক্বনা”ও লেখকের জীবদ্দশাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং হাম্বলি ফক্বীহদের নির্ভরতার স্থান অর্জন করে। শাইখ আল-হাজ্জাওয়ি “আল-ফুরু” এবং “আত-তানকীহ”-এর উপর মূল্যবান হাশিয়া লিখেছেন। এছাড়াও তিনি হাম্বলি ফিকহের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইমাম ইবন কুদামাহর “আল-মুক্বনি”কে সংক্ষিপ্ত করে আরেকটি ‘মতন’ রচনা করেন, আর সেটিই হচ্ছে বিখ্যাত “যাদ আল-মুস্তাকনি”।

সুতরাং এই দুটি গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর থেকে সিংহভাগ মাস’আলায় হাম্বলি মাযহাবের মু’তামাদ মত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি কোন মাস’আলার হুকুমের ক্ষেত্রে “আল-ইক্বনা” এবং “আল-মুনতাহা” মিলে যায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়ে থাকে, তাহলে সেটিই হচ্ছে মাযহাবের মত। আর যদি এমন হয় যে, কোন মাস’আলার হুকুম যে কোন একটি গ্রন্থে আছে, কিন্তু অন্যটিতে নেই, তাহলে সে বিদ্যমান মতটিই হলো মাযহাব।

“আল-মুনতাহা” এবং “আল-ইক্বনা”র সমন্বয়ই যদি হাম্বলি মাযহাব হয়ে থাকে, তাহলে কেমন হয় যদি এই দুটি ‘মতন’কে একটিতে পরিণত করা যায়? পরবর্তীতে সে চেষ্টাই করেছেন শাইখ মার’ই বিন ইউসুফ আল-কারমি (১০৩৩হি), তার “গায়াতুল মুনতাহা ফিল জাম’ই বাইনাল ইক্বনা ওয়াল মুনতাহা” গ্রন্থে। তিনি “আল-মুনতাহা”র বাক্যবিন্যাস অনুসরণ করে এর সাথে “আল-ইক্বনা”তে আলোচিত অতিরিক্ত মাস’আলাগুলোকে সন্নিবেশিত করেছেন। “আল-মুনতাহা” ও “আল-ইক্বনা”র মতবিরোধের ক্ষেত্রে তিনি অধিকাংশ সময় “আল-মুনতাহা”কে প্রাধান্য দিয়েছেন। অল্প কিছু ক্ষেত্রে “আল-ইক্বনা”কে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং খুবই অল্প কিছু মাস’আলায় তিনি উভয়ের বিপরীতে নিজের মত উল্লেখ করেছেন। “আল-মুনতাহা” এবং “আল-ইক্বনা”র পর শাইখ মার’ইর “আল-

গায়া” হাম্বলি মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এর বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে। শাইখ মার'ই হাম্বলি মাযহাবের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি সংক্ষিপ্ত ‘মতন’ রচনা করেন, যার নাম “দালিলুত ত্বালিব”। ফিকহে পাঠদানের নাজদিদের মধ্যে “যাদ আল-মুস্তাকনি” যেমন বিখ্যাত, শামের হাম্বলি ফক্বীহদের কাছে “দালিলুত ত্বালিব” তেমন।

শেষ অধ্যায়

“আল-ইক্বনা” এবং “আল-মুনতাহা” রচিত হওয়ার পর মাযহাবের মু’তামাদ মত তো নির্ধারিত হয়ে গেল, এবার শুধুমাত্র বাকি থাকলো, এই মু’তামাদ মতের ‘মতন’গুলোকে ব্যাখ্যা করার কাজটি। আর এই কাজটিই অনবদ্যভাবে সম্পাদন করেছেন মুহাক্কিকুল মাযহাব আশ-শাইখ আল-আল্লামা মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি (১০৫১হি)।

১) প্রথমেই শাইখ “আল-মুনতাহা”র উপর একটি হাশিয়া লিখলেন, “ইরশাদু ‘উলিন নুহা লি দাক্বাইক্বিল মুনতাহা” নামে, যা শেষ হয় ১০৩৬ হিজরিতে।

২) এরপর শাইখ “আল-ইক্বনা”র উপর একটি হাশিয়া লিখলেন, ১০৪০ হিজরিতে।

৩) এরপর “যাদ আল-মুস্তাকনি”কে ব্যাখ্যা করলেন, তার বিখ্যাত “আর-রওদ্ব আল-মুরবি’” শিরোনামে, ১০৪৩ হিজরিতে।

৪) এরপর এরপর “আল-ইক্বনা”কে ব্যাখ্যা করলেন “কাশশাফ আল-ক্বিনা’ লি মতন আল-ইক্বনা”; ১০৪৫ হিজরিতে।

৫) এরপর মাযহাবের মুফরাদাতের*[2] মু’তামাদ মানযুমাহ ইমাম আল-‘উমাইরির “আন-নাযম আল-মুফিদ আল-আহমাদ”কে ব্যাখ্যা করলেন, “আল-মিনাহ আশ-শাফিয়াত বি শারহিল মুফরাদাত”; ১০৪৭ হিজরিতে।

---

[2] **মুফরাদাতুল হানাবিলাঃ**

আল-মুফরাদাত হলো এমন কোন মাস'আলা যেখানে সুপরিচিত চার মাযহাবের কোন একজন ইমাম বাকি তিন মাযহাবের প্রসিদ্ধ (মাশহুর) মতের বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন।

এধরনের মুফরাদাতের ব্যাপারে যে মাযহাবের 'আলিমগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক বই লিখেছেন, তারা হলেন 'উলামা আল-হানাবিলা। বিশেষত ইমাম আল-ক্বাদি আবু ইয়ালার (রাহিমাহুল্লাহ) সমকালিন 'আলিমগণ। এর একটা কারণ আছে। কারণটা হলো ঐ সময়টাতে একটা দাবি উঠেছিল যে, হাম্বলি মাযহাব আসলে স্বতন্ত্র কোন মাযহাবই না, বরং এটি হচ্ছে শাফেয়ি মাযহাবের একটা প্রশাখার মত, যেখানে শাফেয়ি মাযহাবের হাতেগোণা কিছু মাস'আলার সাথে তারা দ্বিমত করেছে এবং সেখানেও তাদের অবস্থান দূর্বল। এমনকি ইমাম ইলকি আল-হাররাসি (রাহিমাহুল্লাহ), যিনি তার সময়ের শাফেয়িদের একজন ইমাম ছিলেন, তিনি হাম্বলিদের মুফরাদাতের খন্ডন করে একটা আস্ত বই-ই লিখে ফেলেন (নাক্বদ মুফরাদাত আল-ইমাম আহমাদ)। এই ঘটনার পর হাম্বলি 'আলিমগণ একটু নড়েচড়ে বসেন। এরপর তারা ইমাম আহমাদের মুফরাদাতগুলোকে একত্রিত করতে শুরু করেন, সেগুলোর পক্ষে দলিল উপস্থাপন করেন এবং বিপরীত মতগুলোর দূর্বলতা তুলে ধরেন। এভাবেই সেই যুগে “আল-মুফরাদাত” নামে বেশ কয়েকটি বই রচিত হয়। পরবর্তীতে ইমাম আল-'উমারি (রাহিমাহুল্লাহ) ১০০০ লাইনের একটি মানযুমাহ লিখে ফেলেন যার নাম "আল-নাযম আল-মুফিদ আল-আহমাদ ফি মুফরাদাত

৬) এরপর ব্যাখ্যা রচনা করলেন “আল-মুনতাহা”র, “দাক্কাইক্কু ‘উলিন নুহা লি শারহিল মুনতাহা” নামে; ১০৪৯ হিজরিতে।

অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, শাইখ মানসুর আল-বুহুতি পুরো হাম্বলি মাযহাবকেই যেন ব্যাখ্যা করে গেছেন। আর এজন্যই তাকে “শারিহুল মাযহাব” বলা হয়। এত কম সময়ের মধ্যে শাইখ মানসুর কীভাবে এতগুলো শারহ রচনা করলেন, সেটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এটি হাম্বলি মাযহাবের উপর তার দক্ষতার পরিচায়ক। একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, এখানে শারহ মানে লেখকের প্রতিটি অস্পষ্ট শব্দকে ব্যাখ্যা করা, কঠিন বাক্যবিন্যাসকে সহজভাবে তুলে ধরা, হুকুমের অস্পষ্টতা দূর করা, মাযহাবের মু’তামাদ অবস্থান পরিষ্কার করা, মাযহাবের পক্ষে দলিল পেশ করা, হাদিসগুলোর মান বর্ণনা করা ইত্যাদি। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, শাইখের একটি বই, তার অন্য বই থেকে পাঠককে অমুখাপেক্ষী করে না, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ “আল-মুনতাহা”র হাশিয়াতে এমন কিছু বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন, যা এর শারহে নেই; আবার হয়তো “আল-ইক্কনা”র শারহে এমন অনেক কিছু আছে, যা এর হাশিয়াতে পাওয়া যাবে না। শাইখ মানসুরের মৃত্যুর পর আর কোন হাম্বলি ফক্কীহ তার স্তরে পৌঁছাতে পারেননি।

তবে হাম্বলি মাযহাবের জন্য শাইখ মানসুরের কাজ এখানেই শেষ নয়, সর্বশেষ তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাযহাবের মু’তামাদ মতের উপর একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত ‘মতন’ রচনা করে যান, আর সেটি হচ্ছে “উমদাতুত ত্বালিব”।

শাইখ মানসুর আল-বুহুতির অন্যতম ছাত্র হলেন তার ভাগ্নে ও মেয়ের জামাই শাইখ মুহাম্মাদ আল-খালওয়াতি (১০৮৮হি)। তিনিও “আল-মুনতাহা” এবং “আল-ইক্কনা”র উপর হাশিয়া লিখেছেন। তার অন্যতম ছাত্র মাসজিদুল হারামের খতিব এবং শিক্ষক শাইখ উসমান বিন ক্কাইদ আন-নাজদি (১০৯৭হি), তিনিও “আল-মুনতাহা”র উপর হাশিয়া লিখেছেন এবং শাইখ আল-বুহুতি”র “উমদাতুত ত্বালিব”-এর একমাত্র শারহটি রচনা করেছেন, আর সেটি হচ্ছে “হিদায়াতুর রাগিব”।

পরবর্তী ‘আলিমদের মধ্যে শাইখ আল-বালবানি (১০৮৩হি) রচিত “আখসার আল-মুখতাসারাত” এবং “কাফি আল-মুবতাদি” সংক্ষিপ্ত ‘মতন’ দুটি উল্লেখযোগ্য। শামে মাযহাবের সর্বশেষ

মাযহাব আল-ইমামি আহমাদ"। শাইখুল মাযহাব ইমাম মানসুর আল-বুহুতি (রাহিমাহুল্লাহ) এই মানযুমাহ শারহ করেছেন (আল-মিনাহ আশ-শাফিয়াত)।

উল্লেখযোগ্য ফক্বীহ হলেন শাইখ ইবন বাদরান (১৩৪৬হি)। ইবন বাদরানের পর তার সমপর্যায়ের আর কোন হাম্বলি ফক্বীহ আসেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, হিজরি দশম হিজরির পূর্বে মাসজিদুল হারামে কয়েকজন ইমাম ছাড়া নাজদে উল্লেখযোগ্য কোন হাম্বলি ফক্বীহের নাম ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেননি। তবে নাজদের সাথে ইরাক, শাম ও মিসরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বহু পুরোনো এবং সেখানে তাদের যাওয়া-আসা ছিল। কিন্তু একাদশ হিজরির শেষ থেকে বিশেষত শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব এবং তার "নাজদি দাওয়াহ"র অভ্যুত্থানের পর থেকে নাজদে হাম্বলি মাযহাব শক্তভাবে গেঁড়ে বসে এবং এখান থেকে কাতার, আহসা, বাহরাইন, আরব আমিরাত, ওমান এবং কুয়েতে প্রবেশ করে। তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র অর্থাৎ বর্তমান সৌদি আরব এবং কাতারের রাষ্ট্রীয় মাযহাব হলো আল-মাযহাব আল-হাম্বলি। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে "মাস্টার্স" ও "পিএইচডি"র থিসিস হিসেবে পুরোনো গ্রন্থগুলোর তাহক্বীককে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য করার পর থেকে হাম্বলি মাযহাবের অনেক পুরোনো গ্রন্থ তাহক্বীক করে প্রকাশিত হয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ২৫০-এর কাছাকাছি।

ফিকহি বা আক্বাদি যে কোন মাযহাবের বিস্তৃতি মূলত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে। আর একারণেই ফিকহি মাযহাবগুলোর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হানাফি মাযহাব বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত এবং হাম্বলি মাযহাব সবচেয়ে কম বিস্তৃত মাযহাব। হাম্বলি মাযহাবের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান জানতে লেখার শেষে পরিশিষ্ট দেখুন।

তবে শিক্ষা উপকরণের ইন্টারনেট রিসোর্সের হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে আছে হাম্বলি ও শাফেয়ি মাযহাব। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে হাতেগোণা কয়েকজন ত্বালিবুল ইলম হয়তো অনলাইনে হাম্বলি ফিকহ শিখেছে বা শিখছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এতদিন পর্যন্ত কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হাম্বলি ফিকহ পড়ায়নি। আনন্দের খবর হচ্ছে, উস্তায Ma'inuddin Ahmad প্রতিষ্ঠিত Islamic online Academy (IOA) সর্বপ্রথম বারের মত এই সুযোগ এনে দিচ্ছে। আমরা তার এই প্রচেষ্টার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি (জাযাহুল্লাহু খাইরান ওয়া হাফিযাহু) এবং একাডেমির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

[সমাপ্ত]

তথ্যসূত্র

১) *আল-মাদখাল আল-মুফাসসাল লি মাযহাবিল ইমাম আহমাদ*, শাইখ বাকর আব্দুল্লাহ আবু যাইদ [১৪২৯হি]।

২) *মাদারিজ তাফাক্কুহ আল-হানবালি*, শাইখ আহমাদ বিন নাসির আল-কু’আইমি।

পরিশিষ্ট

হাম্বলি মাযহাবের ভৌগলিক চিত্র[3]

শায়খ মুস্তাফা হামদু আশ-শামি তার 'ইদা'আতুন আলা মানহাজিল ইমাম আহমাদ' শীর্ষক বইয়ে এ-যুগে হানবালি মা্জহাবের বিস্তার তুলে ধরেছেন। হানবালিরা রয়েছে সিরিয়ার দামেস্কের বিভিন্ন কুরাতে, যেমনঃ দুমা, দামির, রাহিবা। আরো রয়েছে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকায়, যেমনঃ নাবলুস, তুল কারাম। হিজায, আহসা ও নাজদের বহু এলাকায় হানাবিলার উপস্থিতি সর্বজনবিদীত। সম্মিলিত আরব আমিরাতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমাদের মাজহাবের সদর্প পদচারনা রয়েছে, যেমনঃ কুয়েত, শারজা, রা'সুল খাইমা। কাতারে সরাসরি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় হানবালি মাজহাব লালন করা হয়। মিশর ও ইরাকে হানবালি মাযহাবের সনাতনী দারস ও শিক্ষার সিলসিলা ছোট আকারে হলেও শক্তভাবে উপস্থিত আছে। উপরোক্ত সবগুলো অঞ্চলে আমাদের মাজহাবকে শুধু সাংস্কৃতিকভাবে চর্চা করা হয়না, বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে হানবালি মাজহাবের বিভিন্ন আকরগ্রন্থ এবং চিন্তা-ভাবনা আরব ছাড়িয়ে গিয়ে পশ্চিম ও প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ রূপে হাজির হয়েছে। উপমহাদেশে সালাফি দাবীদার অনেক জনতা হানবালিদের বিভিন্ন বই পড়ে, তাদের চিন্তার কিছু কিছু অংশ চর্চা করে (কিছু সঠিক রূপে, কিছু বিকৃত)। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে কিছু প্রাক্তন সালাফিরা নিজেদের উদ্যোগে হানবালি মাজহাব শিখছে। বিশেষ করে হেজাজ ও মিশর ফেরত শিক্ষকদের মাধ্যমে। ইন্দোনেশিয়ায় হানবালি মাজহাবের অনেক বই অনূদিত হয়েছে। রাশিয়া, বসনিয়া, মধ্য এশিয়া, চীন এবং জাপানে সালাফি প্রভাবিত মসজিদ ও মক্তবে হানবালিদের বইপুস্তক পড়ানো হয় বিচ্ছিন্নভাবে।

পশ্চিমের হানবালিরা আরো সংঘঠিত। এ যুগের অন্যতম হানবালি আলিম এবং মাজহাবের গর্ব শায়খুনা ওয়ালিদ ইবন ইদরিস আমেরিকার মিনেসোটাতে হানবালি মারকাজ খুলেছেন। এই মাদ্রাসায় ধরে ধরে হানবালি আকরগ্রন্থ পড়িয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। আরব হতে বাঘা বাঘা ওলামা শায়খ ওয়ালিদের আমন্ত্রণে মিনেসোটাতে দারস দিয়ে যান। তুর্কিতে তার মাদ্রাসার একটি শাখাও খোলা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের জামেয়া ইশায়াতুল উলুমে শায়খ এক সপ্তাহব্যাপী দারস দিয়ে গিয়েছেন শত শত ছাত্রের উপস্থিতিতে। শায়খ ওয়ালিদের সাথে মাজহাবের গর্ব ইবন তায়মিয়্যাহ আল-হাররানির অবিচ্ছিন্ন সনদ রয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপে মাজহাব ঘেষা অনেক প্রতিষ্ঠান

[3] মূল লেখাটি পড়ুনঃ https://bit.ly/2X26Yeq

রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের সবাই মাজহাবের প্রতি যত্নশীল থাকেন তা নয়। বরং তাদের অনেকে সৌদী সরকারী আলেমদের অন্ধ অনুসরণে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন।

এটি মোটামুটিভাবে বর্তমানে আমাদের মাজহাবের সার্বিক চিত্র।